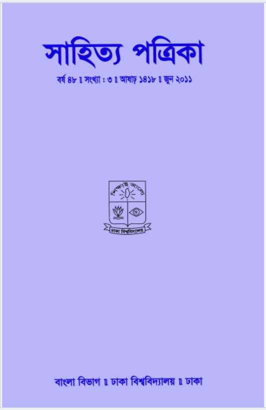

Vol. 48 | No. 3 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাঞ্চনমালা: ইতিহাসের শিল্পরূপ

Volume	48
Issue	3
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Gias Shamim
Published online	June 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i3.4
Pages	৭৫-৮৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *কাঞ্চনমালা* : ইতিহাসের শিল্পরূপ

Check for updates

গিয়াস শামীম*

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় অবদান রাখলেও ভারততত্ত্ববেত্তা হিসেবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর[১](১৮৫৩-১৯৩১) অবস্থান সর্বজনবিদিত। বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কার ও সম্পাদনাই শুধু নয়, সৃজনশীল সাহিত্যরচনায়ও তিনি উৎকীর্ণ করেছেন তাঁর মনন ও মনীষার স্বাক্ষর। তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী ভারততত্ত্ববিদ। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সমাজ-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রজ্ঞামণ্ডিত স্বচ্ছদৃষ্টি; যার প্রতিফলন তাঁর বিচিত্রমাত্রিক সাহিত্যকর্মে লক্ষণীয়। সৃজনশীল রচনায়, বিশেষত উপন্যাসে তাঁর ভারততত্ত্বসম্পর্কিত বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর সুচিহ্নিত। প্রথম উপন্যাস *কাঞ্চনমালায়*[২] তিনি অবলম্বন করেছেন বৌদ্ধ ধর্মৈতিহ্য এবং অসাধারণ নৈপুণ্যে সুদূর অতীতের আলো-অন্ধকারময় জীবনবাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছেন শিল্পরসে জারিত করে। বৌদ্ধধর্মের রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার-মূল্যবোধ, প্রচার-প্রসার, শাসন-অনুশাসন-প্রশাসন প্রভৃতি এ উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে অত্যাশ্চর্য দক্ষতায়; সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের এক অজ্ঞাত কৌতূহলোদ্দীপক জীবনভাষ্য অভিব্যঞ্জিত হয়েছে নান্দনিক শিল্পসমগ্রতায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিজাত বিদ্যাজীবী নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বংশের যোগ্য উত্তরাধিকার। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য ছিল সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ : বাংলা, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ, হিন্দি, রাজস্থানি, গুজরাটি, মৈথিলি ভাষায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। প্রত্নতত্ত্বেও তাঁর ঔৎসুক্য ছিল সুগভীর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদগ্ধজনের স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম.এ. ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি প্রত্যক্ষ সাহচর্য অর্জন করেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের, যিনি আধুনিককালের বৌদ্ধ শাস্ত্রালোচনায় ছিলেন অগ্রগণ্য পথিকৃৎ। তাঁর শিষ্যত্ব ও সান্নিধ্যে প্রাচ্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে ব্যাপক কৌতূহলী হয়ে ওঠেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তদুপরি এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সংস্পর্শে তাঁর জ্ঞানানুসন্ধান অর্জন করে বিশাল ব্যাপকতা। আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতিসত্তার পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেন গভীরভাবে। বৈদিক, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষার সুবিস্তৃত পুঁথির সমুদ্র অবগাহন ও মন্থন করে তিনি যে অমৃতভাণ্ডারের সন্ধান পান তা আকণ্ঠ পান করে তিনি হয়ে ওঠেন ভারততত্ত্ববিদ, অর্জন করেন বিরল সম্মান, প্রাপ্ত হন 'শাস্ত্রী', 'মহামহোপাধ্যায়' প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ উপাধি।

বস্তুত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার কারণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন-পরিশীলনে ব্যাপকভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আত্মত্যাগিদে

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উদ্বোধিত হয়ে তিনি প্রবৃত্ত হন পুঁথিসংগ্রহ, সম্পাদনা, তালিকা প্রণয়ন, শিলালেখ ও অনুশাসনের অনুসন্ধান ও পাঠোদ্ধারে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গবেষণাগ্রন্থ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২) গ্রন্থে সংকলিত বৌদ্ধপুরাণের নানা বিষয় অনুবাদের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধধর্ম-ইতিহাস প্রসঙ্গে তাঁর মননশীল অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণাধর্মী ভাবনা-চেতনার স্বাক্ষর মুদ্রিত করেন। এই পর্যায়ে 'হরপ্রসাদ বাঙালির আত্মপরিচয় উদ্ধারে ব্রতী হয়ে নিজের আবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে স্থির সিদ্ধান্ত করেন, বাংলার জনবৃত্তে আর্যের মাত্রা বহুলাংশে কম, দেশীয় মাত্রা অনেক বেশি। আর্যপ্রভাব, ব্রাহ্মণ্য প্রভাব কখনো বাংলায় সর্বাত্মক হয়নি। বরং বাঙালি সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল বৌদ্ধধর্ম। মুসলমান আধিপত্যের আগে ব্রাহ্মণ্য-র চেয়ে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তিত রূপ বজ্রযান-সহজযান বাংলার লোকসমাজে প্রবল ছিল' (বাংলাপিডিয়া ২০০১ : ৪০৫)। মূলত এ উপলব্ধি থেকেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর বিচিত্রমাত্রিক সাহিত্যকর্মে, বিশেষত উপন্যাসে বৌদ্ধ ধর্মৈতিহ্য ও ইতিহাসকে প্রবল আগ্রহে গ্রহণ করেছেন, রচনা করেছেন *কাঞ্চনমালা* ও *বেনের মেয়ে*। *কাঞ্চনমালায়* বৌদ্ধধর্মের গৌরবিত উত্থানপর্ব এবং *বেনের মেয়েতে* প্রতিফলিত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের পতনশীল বাস্তবতার চিত্র। বর্তমান আলোচনা *কাঞ্চনমালা*কেন্দ্রিক।

কাঞ্চনমালা উপন্যাসে পরিগৃহীত হয়েছে সম্রাট অশোকের[৩] জীবন ও রাজত্বকালের একটি বিশেষ অধ্যায়। বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের[৪] শক্তিমান শাসক অশোকের রাজ্যপরিচালনা, রাজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চাতুর্বর্ণ্যের অন্তর্বর্তী ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্র-প্রতিহিংসা ও বৌদ্ধধর্মবিস্তারের বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে এ-উপন্যাসের ঘটনাংশ। প্রধানত ইতিহাস-নির্দেশিত তথ্যের সঙ্গে "মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র 'দিব্যাবদান' এবং একাদশ শতকের কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র 'কুনাল অবদান' আশ্রয় করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস রচনা করেন" (শিপ্রা ২০০৯ : ৭৬)। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ-উপন্যাসের কাহিনী প্রধানত আবর্তিত হয়েছে অশোকপুত্র কুণাল[৫] এবং তার স্ত্রীর কাঞ্চনমালার সদ্ধর্মপ্রচারকে কেন্দ্র করে। নানা ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জীবনপরিসরে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম কীভাবে বিস্তৃত হতে চলেছে তা উপন্যাসের পরিচ্ছেদ-পরম্পরায় অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন লেখক।

ঘটনাপ্রধান এ-উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে কুণাল-কাঞ্চনমালার রোমান্টিক প্রণয়প্রসঙ্গ। প্রায় দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্বে পাটলিপুত্র নগরের গঙ্গাতীরবর্তী প্রমোদোদ্যান হচ্ছে উপন্যাসের প্রারম্ভিক পরিপ্রেক্ষিত। ললিতবিস্তর নাটকে অভিনয়ের প্রাক-প্রস্তুতি পর্বে কুণাল-কাঞ্চনের পুষ্পসজ্জার বর্ণনা প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক কুণালের স্মৃতিময় অনুষঙ্গে তার ত্রিরত্নলাভ, কাঞ্চনের সদ্ধর্মানুষ্ঠান, বোধিবৃক্ষমূলে কুণাল-কাঞ্চনের পরিচয়, উদ্বাহপর্ব এবং সদ্ধর্মের জন্য উভয়ের জীবনোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা বর্ণিত হয়েছে। নাটকীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনাংশ।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অশোক-পত্নী তিষ্যরক্ষা কর্তৃক কাঞ্চনের পুষ্পসজ্জা অপহরণ, ললিতবিস্তরের তৃতীয় পরিচ্ছেদে মারপত্নীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য কুণালের

সঙ্গে তিষ্যরক্ষার অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি, সপত্নী-পুত্র কুণালের প্রতি তিষ্যরক্ষার অনৈতিক ইন্দ্রিয়াসক্তি, কুণালকে প্রলোভিত করে তার প্রণয় অর্জনের জন্য তিষ্যরক্ষার অদম্য প্রয়াস এবং কুণাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গ অভিব্যক্ত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, বিচিত্র প্রতিকূল পরিবেশে পাটলিপুত্রের দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম বৌদ্ধ কুণাল এবং কাঞ্চনমালা সদ্ধর্মের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিজেদের জীবনোৎসর্গের সংকল্প ব্যক্ত করেছে। বুদ্ধশিষ্য উপগুপ্ত কর্তৃক অশোক-তিষ্যরক্ষা, কুণাল-কাঞ্চনের দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ, স্বাভাবিক প্রণয়প্রকাশের মাধ্যমে কুণালকে অর্জনে ব্যর্থ হয়ে তিষ্যরক্ষার দুরভিসন্ধি প্রভৃতি প্রসঙ্গ ভাষারূপ অর্জন করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে প্রাকবিবাহ পর্বে তিষ্যরক্ষা ও অশোকের জীবনযাপনবৃত্তান্ত এবং পারস্পরিক পরিচয়প্রসঙ্গ। তিষ্যরক্ষা একজন ক্ষৌরকারের কন্যা। শৈশবাবস্থায় গণককর্তৃক উচ্চারিত অদৃষ্টপ্রসঙ্গ অবগত হয়ে সে হয়ে ওঠে উচ্চাভিলাষী। সৌভাগ্যবশত বিন্দুসার-পুত্র দুর্বৃত্ত অশোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয় কীকট দেশের দক্ষিণস্থিত অরণ্যবাসী সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে। উভয়ে চরিত্র সংশোধনার্থে আশ্রমে প্রেরিত হলেও অবিলম্বে চরিত্রস্খলনে উৎসাহী হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে বিকৃতবুদ্ধি-তিষ্যরক্ষা অশোকের সঙ্গে স্থাপন করে শরীরীসম্পর্ক এবং অতঃপর চাতুর্যের মাধ্যমে পিঙ্গলবৎসের উদ্যোগে বিবাহ করে অশোককে। স্বল্পকাল ব্যবধানে তক্ষশীলায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা বিদ্রোহ শুরু করলে তাদের দমনের জন্য বিন্দুসার সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করেন অশোককে এবং প্রেরণ করেন তক্ষশীলায়। অন্যদিকে দুর্মতি তিষ্যরক্ষা সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে শাশুড়ি সুভদ্রাঙ্গীকে বশীভূত করে রাজঅন্তঃপুরে বিস্তার করে একাধিপত্য। অতঃপর চাণক্যের মন্ত্রশিষ্য রাধগুপ্তের মাধ্যমে সে প্রশাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয় এবং বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র সুষীমের বিরুদ্ধে প্রজাবর্গকে বিদ্রোহী করে তোলে। অনন্যোপায় বিন্দুসার সুষীমকে তক্ষশীলায় প্রেরণ করেন এবং অশোককে প্রদান করেন পাটলিপুত্রের দায়িত্ব। অকস্মাৎ এক রহস্যজনক কারণে রাজা ও রাজমন্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে অশোক রাজপদে অভিষিক্ত হন, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাধগুপ্ত। অশোকের পাটরানীর মর্যাদা পান তাঁর প্রধানমহিষী পরিষ্যরক্ষিতা। অনতিকাল ব্যবধানে সুষীমের বিদ্রোহ দমন করেন অশোক, হয়ে ওঠেন বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক :

> তাহার পর চন্দ্রগুপ্তের বংশীয় গর্ভস্থ শিশুরও প্রাণসংহার করিয়া অশোক বিস্তীর্ণ মগধ সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। [কেবল] মাতা সুভদ্রাঙ্গীর একান্ত অনুরোধে স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বীতাশোককে জীবিত রাখিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা তাঁহাকে ধর্মভ্রষ্ট করিয়া বৌদ্ধ মঠে আবদ্ধ করিবার পরামর্শ দিল। বীতাশোক শাক্যভিক্ষু হইয়া পৌণ্ড্রবর্ধন নগরে ভিক্ষা দ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিল। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ১১৫)

পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিষ্যরক্ষা তার অনৈতিক ইন্দ্রিয়জ লালসা চরিতার্থ করবার জন্য কূটকৌশল প্রয়োগে পরিষ্যরক্ষিতার পত্র ব্যবহার করে কুণালকে বিলাসকুঞ্জে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু কুণালের মনোজাগতিক দৃঢ়তার কারণে ব্যর্থ হয় তার অপবাসনা। এই বিলাসকুঞ্জে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে মহামাত্য ব্রাহ্মণসহ পাটরানী পরিষ্যরক্ষিতার বোধিদ্রুম অপহরণবিষয়ক দুরভিসন্ধি প্রত্যক্ষ করে তিষ্যরক্ষা। বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের প্ররোচিত

করার এ ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে তিষ্যরক্ষা তার পাপ-অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে অনেকদূর এগিয়ে যায়। কাঞ্চনমালাকর্তৃক কুণালকে স্বপ্নমাধ্যমে অন্ধরূপে প্রত্যক্ষ করবার ঘটনা সংযোজন করে এ-পরিচ্ছেদে নাটকীয় আবহ তৈরিতে সক্ষম হন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

তিষ্যরক্ষার কূটকৌশল জয়ী হয় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। বোধিদ্রুম অপহরণ করে ব্রাহ্মণবিদ্রোহে প্ররোচনাদানে ব্যর্থ হয় পরিষ্যরক্ষিতা ও মহামাত্য কুঞ্জরকর্ণ। তিষ্যরক্ষা তার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র সফল করবার জন্য অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কুঞ্জরকর্ণের প্রাণরক্ষা করে তাকে প্রেরণ করে তক্ষশীলায়। অতঃপর ঋদ্ধিবলে সে দেবভবন থেকে বোধিবৃক্ষ পুনরানয়ন করে। এর ফলে ব্রাহ্মণদের মহিমা অবনত হয়, বৌদ্ধরা হয় জয়োল্লাসে মুখরিত। পরিষ্যরক্ষিতা অবরুদ্ধ হয় পৌণ্ড্রবর্ধনের দুর্গে। তিষ্যরক্ষা প্রাপ্ত হয় অশোকের পাটরানীর মর্যাদা। ধীরে ধীরে তিষ্যরক্ষার ক্ষমতার পরিসর বেড়ে যায়, অশোকের পরিবর্তে সে-ই হয়ে ওঠে ক্ষমতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বরী। ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করেও কুণালের প্রণয়ভাগিনী হতে না পেরে অবশেষে হীনপন্থার আশ্রয় নেয় তিষ্যরক্ষা।

সপ্তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে তিষ্যরক্ষার অসামান্য দক্ষতায় বৌদ্ধধর্মের উত্তরোত্তর প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির প্রসঙ্গ। দয়ায়-দাক্ষিণ্যে-লোকহিতে তিষ্যরক্ষা যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু কুণাল ছাড়া তার জীবন-যৌবন অর্থহীন। এমতাবস্থায় একদিন তিষ্যরক্ষা তার দেহ ও গৃহকে বিলাসকুঞ্জ সাজিয়ে কুণালকে নিবেদন করে। কুণালের কাছ থেকে অবমাননাকরভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার 'বহুক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষার চৈতন্য হইল। সে ফণিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। চুল গুছাইল। যে পথে কুণাল গিয়াছে, সেই দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "যদি ওই চোখ —" পরে মাটিতে পা ঘষিয়া বলিল, "যদি ওই চোখ — একদিন এমনি করিয়া পদতলে দলিত করিতে পারি, তবেই আমি তিষ্যরক্ষা।"(শাস্ত্রী ১৯৯১ : ১৩৯)

তিষ্যরক্ষার অনুগ্রহধন্য কুঞ্জরকর্ণের নেতৃত্বে তক্ষশীলায় বিদ্রোহ প্রসঙ্গ উপস্থাপনসূত্রে সূচিত হয়েছে অষ্টম পরিচ্ছেদের বর্ণনাংশ। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য কুনালকে প্রদান করা হয় সর্বপ্রধান সেনাপতির পদ। এ-পদপ্রাপ্ত হয়ে কুণাল নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে; কারণ সে তিষ্যরক্ষার পাপদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হবে এবং ত্রিশরণের সেবায় জীবনোৎসর্গ করতে সক্ষম হবে। স্ত্রী কাঞ্চনমালাও সদ্ধর্মপ্রচারে সংকল্পচিত্ত স্বামী কুণালকে বিদায় জানায় অকুণ্ঠিতভাবে।

কুণালের রণদক্ষতা প্রসঙ্গ ভাষারূপ পেয়েছে নবম পরিচ্ছেদে। বুদ্ধিবল ও দৈবনির্বন্ধে তক্ষশীলার যুদ্ধে জয়ী হয় কুণাল, বন্দি হয় কুঞ্জরকর্ণ। পরাজিত কুঞ্জরকর্ণের রহস্যময় আচরণে বিস্মিত হয় কুণাল। সে দূতের মাধ্যমে অশোকের কাছে পত্রপ্রেরণ করে জানতে চায় কুঞ্জরকর্ণের জন্য সম্ভাব্য কী শাস্তি নির্দিষ্ট হতে পারে !

উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদ থেকে ঘটনাংশ ধাবিত হয়েছে দ্রুত পরিণতির দিকে। কুণালের পত্র রাজধানী পাটলিপুত্রে অশোকের হাতে পৌঁছার পূর্বেই পরিবর্তিত হয় ক্ষমতা; অশোকের পরিবর্তে রাজ্যভার গ্রহণ করে তিষ্যরক্ষা। দুরারোগ্য কালব্যাধি থেকে অশোককে সুস্থ করে তোলার জন্য তিনি তিষ্যরক্ষাকে বরস্বরূপ এক বছরের জন্য পাটলিপুত্রের

শাসনভার প্রদান করেন। সুতরাং কুঞ্জরকর্ণের ভাগ্য এখন তিষ্যরক্ষার ইচ্ছাধীন। সে কুঞ্জরকর্ণকে তক্ষশীলার শাসনভার অর্পণ করে এবং কুণালের দুচক্ষু উৎপাটনের নির্দেশ দেয়। কুঞ্জরকর্ণ এ আজ্ঞা প্রতিপালন করে; চিরকালীন অন্ধকারে সমর্পিত হয় কুণাল।

একাদশ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হয়েছে স্বামী কুণালের জন্য স্ত্রী কাঞ্চনমালার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বর্ণনা। কাঞ্চনমালা লোকমাধ্যমে কুণালের বন্দিদশার প্রসঙ্গ জ্ঞাত হয়ে তাকে উদ্ধার করবার জন্য তক্ষশীলা যেতে চাইলে বাধা প্রদান করে তিষ্যরক্ষা। অনন্যোপায় কাঞ্চনমালা রাত্রির অন্ধকারে পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করে তক্ষশীলার উদ্দেশে যাত্রা করে। ওদিকে তক্ষশীলা থেকে একজন বিজ্ঞানবিদ বহুকষ্টে পাটলিপুত্র এসে কুণালের বাক্সবন্ধ চক্ষু প্রদান করে তিষ্যরক্ষাকে :

> চক্ষুর কথা শুনিয়া তিষ্যরক্ষা শিহরিয়া উঠিল, বাক্সটি খুলিল, খুলিয়া চক্ষু দুইটি বাহির করিল — দেখিল সে চক্ষু এখনো তেমনি উজ্জ্বল — সে উহা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পাতিত করিয়া পদতলে দলিত করিল — করিয়াই ব্যস্তসমস্তভাবে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।
>
> (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ১৫৯)

গৃহত্যাগী কাঞ্চনমালা স্বামীসঙ্গ অর্জনের প্রত্যাশায় নানা নদী-গিরি-জনপদ-পথপ্রান্তর অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। তার কাছে দিনরাত্রির ভেদ লুপ্ত। পথশ্রমের কষ্ট বিস্মৃত হয়ে সে এগিয়ে চলেছে প্রার্থিত গন্তব্যে। তার অন্তঃপ্রেরণার মূলমন্ত্র হচ্ছে 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। মুক্তিমন্ত্র জপ করতে করতে এক পর্যায়ে সে উপনীত হয় মাণিক্যালার অন্তর্বর্তী এক শালবনে। সেখানে তার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হয় এক চণ্ডালের; যে কুঞ্জরকর্ণের অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রত্যক্ষ করেছে কুণালের চক্ষু উৎপাটনের মর্মান্তিক দৃশ্য। চক্ষু উৎপাটনকালে কুণালের শান্ত সৌম্য মূর্তি দর্শন করে সে নবতর অভিজ্ঞানে জেগে ওঠে, দস্যুতাবৃত্তি পরিত্যাগ করে এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে মানবসেবায় জীবনোৎসর্গ করে। এখানেই কাঞ্চনমালা-চণ্ডাল আবিষ্কার করে সেই হিন্দু চণ্ডালকে, যে কুঞ্জরকর্ণের নির্দেশে স্বহস্তে উৎপাটন করেছিল কুণালের ইন্দ্রিয়দৃষ্টি। এখন সেই হিন্দু-চণ্ডাল মৃত। বৌদ্ধ-চণ্ডাল সেই মৃত হিন্দু-চণ্ডালের দেহ অনুসন্ধান করে একটি সাংকেতিক মোহর অর্জন করে; যা হয়ে ওঠে তক্ষশীলার কারাকক্ষে প্রবেশের একমাত্র উপায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে সাংকেতিক মোহর প্রদর্শন করে কুণালের সন্ধানে বৌদ্ধ-চণ্ডাল ও কাঞ্চনমালা প্রবেশ করে কুঞ্জরকর্ণের কারাকক্ষে। কুণালের অনুগত বন্দি সৈন্যদের তারা মুক্ত করে এবং আক্রমণ করে নিকটবর্তী রাজবাড়ি। এই পর্যায়ে একদিন সন্ধ্যালোকে নিবিড় বনভূমির মধ্যে কুণালকে আবিষ্কার করে কাঞ্চন। কুণাল এখন সর্ব-ধর্ম-মমতাবিপশ্চিৎ নামক সমাধিবলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে এক কূপের মধ্যে অবস্থান করছে। তার মুখে কেবলই ত্রিশরণের মন্ত্র। সে এখন সমাধিপ্রাপ্ত বুদ্ধ; জাগতিক লোভ-প্রলোভন-হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত। ইতোমধ্যে কুণালের বিপদাশঙ্কায় কাতরচিত্ত অশোক পাটলিপুত্র থেকে তক্ষশীলায় এসে উপস্থিত হন। দৃষ্টিশক্তিহীন কুণালকে দেখে তিনি শিউরে ওঠেন। অশোকের নির্দেশে বন্দি করা হয় কুঞ্জরকর্ণকে। সে অশোককে উদ্দেশ্য করে ভ্রষ্টচরিত্রা তিষ্যরক্ষার স্বরূপ উন্মোচন করে বলে :

যাহাকে তুমি ভালোবাস, যাহাকে তুমি রাজ্যেশ্বরী করিয়াছ — সে ভ্রষ্টা, সেই তোমার পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করাইয়াছে, সে বৌদ্ধ নহে সে হিন্দু। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ১৮০)

উপন্যাসের পরিণাম-নির্দেশক পরিচ্ছেদ হচ্ছে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। রাজা অশোক তক্ষশীলা শাসন ও রক্ষণের সুব্যবস্থা করে কুণাল-কাঞ্চনমালাকে নিয়ে আসেন পাটলিপুত্রে। তিষ্যরক্ষা নীত হয় বিচারসভায়। ততদিনে সে উন্মাদদশাগ্রস্ত। তার বিরুদ্ধে বোধিসত্ত্ব কুণালের আর কোনো অভিযোগ নেই। কাঞ্চনমালার ইচ্ছানুক্রমে অশোক তার কাছে অর্পণ করে তিষ্যরক্ষার দায়িত্ব। অতঃপর বাসুকিশীল থেকে প্রত্যাগত এক বিজ্ঞানী বৌদ্ধ-চণ্ডালের চক্ষু নিয়ে বসিয়ে দেন কুণালের চক্ষুকোটরে। অন্ধত্বদশা থেকে মুক্তি পায় কুণাল। ধর্মনিষ্ঠ চণ্ডালও অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত হয় তার দৃষ্টিশক্তি। এই পরিস্থিতিতে বোধিসত্ত্ব কুণালের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে অশোক যে ঘোষণাবাণী প্রচার করেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার তাৎপর্য ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী :

বৌদ্ধধর্ম মগধ সাম্রাজ্যের ধর্ম হইবে। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ১৮৬)

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতবর্ষের দ্বন্দ্বসংঘাতময় রাজনৈতিক ইতিহাসে অশোকের এই ঘোষণা যুগান্তসৃষ্টিকারী। রাজ্য নয়, রাজত্ব নয়, ক্ষমতা নয়, রাজপুত্র কুণাল নির্বিচার ভোগলালসাকে বিসর্জন দিয়ে রাজপিতার কাছে যা প্রত্যাশা করেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা অভিনব ও অভূতপূর্ব। ত্যাগধর্মে অভিসিঞ্চিত কুণালের উদ্যোগে বদলে যায় যুগপ্রচলিত অসূয়া-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, রাজকীয় বিবাদ-বিসংবাদ এবং ক্ষমতাকাঠামো। কুণালের সঙ্গে অশোক এবং বৌদ্ধ-চণ্ডালের কথোপকথনসূত্রে এ-বক্তব্যের সত্যতা স্পষ্ট —

(অশোক) কুণালকে বলিলেন–
"তোমায় পঞ্চনদের ধর্মাধ্যক্ষ ও শাসনকর্তা হইতে হইবে।"
কুণাল বলিলেন–
শাসনকর্তৃত্ব আর-কাহাকেও দেন।"
রাজা বলিলেন–
"তবে কাঞ্চনের উপর সে ভার থাকুক, কাঞ্চন এবার তক্ষশীলা জয় করিয়াছে।"
কুণাল বলিলেন–
"কাঞ্চনও সাংসারিক কার্য ভালোবাসে না।" বলিয়া তিনি চণ্ডালের দিকে মুখ ফিরাইলেন।
চণ্ডাল বলিল–
"প্রভু! আমি নীচ জাতি, আমি গুরুর পদসেবা করিব, শাসনকার্য আমার জন্য নহে দয়াময়।"
রাজা তখন শাসনকার্যের ভার অন্য লোকের হস্তে প্রদান করিলেন। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ১৮৭)

রাজ্য, রাজকীয় ভোগবিলাস আর শাসনকর্তৃত্বের প্রতি কুণাল-কাঞ্চনের অনাগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ব্যক্তির হাতে অর্পিত হয় মগধের শাসনভার। ভোগধর্মের পরিবর্তে বিজয় ঘোষিত হয় ত্যাগধর্মের। এর ফলে বদলে যায় ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও ধর্মনৈতিক মানচিত্র :

এই দিবস যে কার্য হইল, তাহার বলে এক হাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এশিয়া এই দিনের কার্যবলে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ১৮৭)

স্পষ্টত এই উপন্যাসের পট-পরিবেশ, ঘটনাংশ ও চরিত্রপাত্র ইতিহাস ও কিংবদন্তিনির্ভর। সমকাল-পরিসরে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ধারানুবর্তী হয়েও হরপ্রসাদ অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী; কারণ বৌদ্ধধর্ম ও ঐতিহ্যকে উপন্যাসের বিষয়রূপে ইতঃপূর্বে কোনো ঔপন্যাসিকই গ্রহণ করেননি। প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মবিষয়ক যেসব তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন তার সঙ্গে কিংবদন্তি ও হৃদয়বৃত্তির সহযোগ-সন্নিপাতে রচনা করেছেন এই ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস — *কাঞ্চনমালা*। উপন্যাসে সম্রাট অশোকের রাজত্বের বিবরণ, বৌদ্ধধর্মে তাঁর দীক্ষাগ্রহণ, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধ, বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে অশোকের উদ্যোগগ্রহণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ ইতিহাসাশ্রয়ী। কুণালের প্রতি তিষ্যরক্ষার ইন্দ্রিয়াসক্তির বৃত্তান্ত ইতিহাস নয়, বরং কিংবদন্তিসূত্রে অর্জন করেছেন ঔপন্যাসিক। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান আশ্রয় 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'। হরপ্রসাদ ইতিহাস, কিংবদন্তি ও কল্পনাবৃত্তির বিস্ময়কর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন এ-উপন্যাসে।

সম্রাট অশোকের জীবন ও রাজত্বকাল ছিল ঘটনাবহুল ও রোমাঞ্চকর। উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে তাঁর চার দশকব্যাপী রাজত্বকালের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাংশ, যার অধিকাংশই কুণাল-কাঞ্চনমালা-তিষ্যরক্ষাকেন্দ্রিক। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধ এ-উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে যোগ করেছে ভিন্নমাত্রিক অভিব্যঞ্জনা। প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যা ও সংকট এর মাধ্যমে হয়ে উঠেছে তাৎপর্যমণ্ডিত। এই সংকটের কারণ ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ ও বর্ণবিদ্বেষ। ইতিহাসের তথ্যানুযায়ী জানা যায়, সম্রাট অশোক ছিলেন শূদ্র রাজা। তাঁর রাজত্বে গুরুত্ব হারায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম । ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য *কাঞ্চনমালার* মুখবন্ধে অশোকের এই ধর্ম ও বর্ণগত অবস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন :

> চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নানা প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে একত্র করিয়া তাহাদের সাহায্যে গ্রীক রাজপ্রতিনিধিদের ধ্বংস সাধন করিয়া দেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, চন্দ্রগুপ্ত ক্ষুদ্রক মল্লাদি হিমালয় ও হিমালয়-পারের আয়ুধজীবী জাতিদের কোন একটির সর্দার বা নেতা ছিলেন; এবং সে কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত আদিকালে চাতুর্ব্বর্ণ্যের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন না, কিন্তু কৌটিল্যের প্রভাববশতঃ পাটলিপুত্র জয় করার পর বর্ণাশ্রমধর্ম্মী বলিয়াই চলিতেন। শেষে চন্দ্রগুপ্ত শূদ্র বা বৃষল বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার, তাই তিনিও শূদ্র। তাঁহার পুত্র অশোক, কাজেই তিনিও শূদ্র।
>
> তখনকার দিনের ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিশেষ বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমভুক্ত লোকদের জন্য কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ সুখ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের সুখ সুবিধা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অশোক রাজা আদেশ দিয়া এই বিশেষ বিশেষ সুবিধাগুলি বন্ধ করিয়া দেন, এবং ব্রাহ্মণ, শূদ্র, অন্ত্যজের ভিতর কোন ভেদই রাখেন নাই। ইহার উপর বৌদ্ধ ধর্ম-মহামাত্র নিযুক্ত হইল, এবং তাহারা শীঘ্রই ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের স্থান গ্রহণ করিল। ক্ষোভে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রতিশোধের আশায় বসিয়া রহিল। ...তদানীন্তন দেশের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই বৌদ্ধবিরোধী মনোভাবটিকে গ্রন্থকার বার বার সুস্পষ্টরূপে 'কাঞ্চনমালা' গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ৫৯০)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'Causes of the Dismemberment of the Maurya Empire' প্রবন্ধে চাতুর্বর্ণ্যভুক্ত ব্রাহ্মণদের অশোকবিরোধী মনোভাবের কার্যকারণ বিশ্লেষণসূত্রে প্রায় একই বক্তব্য উচ্চারণ করেছেন।[৬] *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে রাধগুপ্ত, পরিষ্যরক্ষিতা, কুঞ্জরকর্ণ প্রভৃতি চরিত্রের ষড়যন্ত্র; বোধিদ্রুম অপহরণ; তিষ্যরক্ষার প্ররোচনায় কুঞ্জরকর্ণের নেতৃত্বে তক্ষশীলায় বিদ্রোহ ও যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা যে এই বিরোধেরই ফল তা প্রদর্শন করেছেন ঔপন্যাসিক। অবশ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষণালব্ধ তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে অশোক ছিলেন প্রজারঞ্জক, ভিন্নধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল :

> It is clear that though Asoka was a Buddhist he was not unconcerned with the welfare of other sects, even those in opposition to Buddhism.
>
> (Romila 1963 : 173)

কাঞ্চনমালা উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র ইতিহাসসম্মত, বাস্তব। সম্রাট অশোক, কুণাল, কাঞ্চনমালা, কুঞ্জরকর্ণ, তিষ্যরক্ষা, পরিষ্যরক্ষিতা প্রভৃতি চরিত্র ইতিহাস থেকে আহৃত। কুণালের বোধিসত্ত্ব অর্জন, তার বিরুদ্ধে তিষ্যরক্ষার ষড়যন্ত্র, কুণালের অন্ধত্ব ইতিহাস-সমর্থিত। অবশ্য কুণালের প্রতি তিষ্যরক্ষার ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণ, কুণালের প্রত্যাখ্যান এবং তৎসূত্রে তিষ্যরক্ষার নির্মম প্রতিজ্ঞা ও কুণালের চক্ষু উৎপাটন প্রভৃতি প্রসঙ্গ ইতিহাস নয়, বরং লোকপুরাণ বা কিংবদন্তিসূত্রে অর্জিত। প্রকৃতপক্ষে কুণালের অন্ধদশা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রেরই কারণ।[৭]

উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে অশোকের বহুমূত্র রোগের প্রসঙ্গ। তিষ্যরক্ষার চিকিৎসা, ক্লান্তিহীন পরিচর্যা ও শুশ্রূষায় আরোগ্যলাভের পর রাজা তুষ্টচিত্তে তাকে বরপ্রদান করলেন এবং ঘোষণা করলেন — 'মহারানী তিষ্যরক্ষা এক বৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্যে সর্বময়ী কর্ত্রী হইবেন।' অশোকের অসুস্থতা, রোগমুক্তি, তিষ্যরক্ষাকে বরদান প্রভৃতি প্রসঙ্গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ক্ষেমেন্দ্র রচিত "বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'ভুক্ত 'কুণাল অবদান' অংশ থেকে অনেকটা বাস্তবতামণ্ডিত করে উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন। কুণাল অবদানে'র প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষ করলে এই পরিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্ট হবে —

> তিষ্যরক্ষা এইরূপে রাজার ধৈর্য্য বিধান করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং অন্বেষণ করাইয়া তুল্য রোগাক্রান্ত একটি আভীরকে একান্তে আনয়ন করাইল।
>
> ক্রূরাশয়া তিষ্যরক্ষা ক্রূরবুদ্ধি একটি দাসীদ্বারা আভীরকে হত্যা করিয়া তাহার নাভিকোষটি উৎপাটন করিল। তৎপরে তাহার অন্ত্রে সংলগ্ন ও কঠিনভাবে দংশনকারী একটি বিকৃত কৃমি দেখিতে পাইল।
>
> তিষ্যরক্ষা দেখিল যে, কৃমিটা বেগে উর্দ্ধে ও অধোদেশে চলাচল করিতেছে এবং বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছে। তৎপরে পিপ্পলী, হিঙ্গু ও বিড়ঙ্গযুক্ত ঔষধ কৃমির উপর নিক্ষেপ করিল।
>
> সেই সেই ক্ষার দ্রব্য ও বিষাক্ত কতকগুলি দ্রব্য দিয়াও কৃমিটা মরিল না। পরে পলাণ্ডু-রস স্পর্শমাত্রেই কৃমি মরিয়া গেল।
>
> তিষ্যরক্ষা এই উপায়টি জানিতে পাইয়া অত্যন্ত হর্ষসহকারে রাজার নিকট গেল এবং প্রচ্ছন্নভাবে পলাণ্ডু-রস সেবনদ্বারা ক্ষণকালমধ্যেই রাজাকে সুস্থ করিল।
>
> তৎপরে কৃতজ্ঞ রাজা জীবন-লাভ-হর্ষে এবং তিষ্যরক্ষার প্রতি প্রেমবশতঃ তাহার প্রার্থনানুসারে সাতদিনের জন্য রাজার কর্ত্তৃত্বভাররূপ বর তিষ্যরক্ষাকে প্রদান করিলেন। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ৬০১)

স্পষ্টত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অশোকের অসুস্থতার বর্ণনা অনেকবেশি বাস্তবোপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে তিষ্যরক্ষাকে এক বছরের জন্য রাজ্যভার প্রদানের তথ্য পরিবেশিত হলেও 'কুণাল অবদানে' সাতদিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কাঞ্চনমালার চরিত্রচিত্রণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কৃতিত্ব স্বল্প। *কাঞ্চনমালা* শিরোনামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ায় মনে হতে পারে সে-ই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় চরিত্র। কিন্তু তার উল্লেখযোগ্য সক্রিয়তার পরিচয় উপন্যাসে অনুপস্থিত। সে দাম্পত্যপ্রেমে একনিষ্ঠ, কুণালের প্রতি নিবেদিতচিত্ত। এই একনিষ্ঠতাকে সম্বল করে সে তিষ্যরক্ষার রাজকীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন করে দুর্গম পথারণ্য পাড়ি দিয়ে কুণালকে উদ্ধারের অভিপ্রায়ে সুদূর তক্ষশীলায় উপনীত হয়েছে। সে সদ্ধর্মনিষ্ঠ, অজটিল ও পবিত্রতার অনুভবে স্নিগ্ধ । মানবিক দৃষ্টিতে সংশয় থাকলেও তাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না।

অশোকপুত্র কুণাল এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে রণদক্ষ সেনাপতি, হৃদয়বান প্রেমিক, একনিষ্ঠ স্বামী; অথচ তিষ্যরক্ষার অনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও আদেশের সামনে নতমস্তক। সে ধর্মাচরণে প্রত্যয়ী, সমাধিপ্রাপ্ত বুদ্ধ, উন্নতচিত্ত সাধক; কিন্তু সত্যধর্ম রক্ষায় নতজানু। তাকে কামনা-বাসনাতাড়িত রক্তমাংসময় চরিত্র বলে মনে হয় না। 'তক্ষশীলায় বৌদ্ধবিরোধী শক্তিগুলির বিপর্যয়ের পরে সেই পরাভূত ব্রাহ্মণদের হাতেই রাজ্যাধিকার তুলে দিতে ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ কুণাল দ্বিধামাত্র করেনি। তার দৃষ্টি কেড়ে নেবার আদেশও নীরবে মেনেছে, জীবধর্মে আত্মরক্ষণের যে স্বাভাবিক তাগিদ থাকে তারও সামান্যতম প্রকাশ নেই কুণালে। বরং অন্ধ হবার ফলে বাইরের পৃথিবী তার কাছে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সম্যক সমাধির অন্তর্লোক উদ্ভাসিত। কারুর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ নেই, ছিলও না। তিষ্যরক্ষার বিরুদ্ধে পূর্বে পরে সে কখনও ঘৃণা পোষণ করেনি' (ক্ষেত্র গুপ্ত ১৯৯৪ : ১৫০)। কুণাল চরিত্রের এসব বৈশিষ্ট্য তাকে হয়তো অসাধারণ করেছে কিন্তু মানবিক করেনি।

ভারতবর্ষের সর্বকালীন ইতিহাসে অশোক মৌর্যের অবস্থান গৌরবের। প্রথম যৌবনের দুর্বৃত্ততা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার পথ অতিক্রম করে ধর্মবোধে, জনকল্যাণধর্মী রাষ্ট্রগঠনে এবং সর্বোপরি মানবিক মহিমা ও বিচক্ষণতায় যে অশোক কালের সীমা অতিক্রম করে হয়ে উঠেছেন কালজয়ী, উপন্যাসে সেই অশোক অনুপস্থিত। ঐতিহাসিকেরা যে অশোককে প্রদীপ্ত নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন[৮], শাস্ত্রীর হাতে সেই অশোক অনুজ্জ্বল ও ম্লান।

উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা সজীব ও প্রাণবন্ত চরিত্র তিষ্যরক্ষা। রক্তমাংসের নারীচরিত্ররূপেই সে একক ও অসামান্য। সপত্নীপুত্র কুণালের প্রতি প্রণয়নিবেদনে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে তার যে আচরণ তা নৈতিকতার বিচারে অসংগত হলেও অস্বাভাবিক নয়; তন্ত্র-মন্ত্র-ষড়যন্ত্র আর অসূয়া-বিদ্বেষতাড়িত রাজপরিবারে এই চিত্র তো প্রাত্যহিক। ঔপন্যাসিক তাকে কামনাতপ্ত প্রগলভ নারীরূপে চিত্রিত করেছেন। তার হৃদয়াবেগ একমুখী, তীব্র, চক্রান্তবুদ্ধি দ্বারা আকীর্ণ। তার কোনো ধর্ম নেই। ছলনা ও নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধিই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সম্রাট অশোকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সে চরিতার্থ করেছে তার অনৈতিক অভিপ্রায়। কুণালের চক্ষু পদতলে পিষ্ট ও মর্দিত করে সে পরিচয় দিয়েছে তুলনাহীন নিষ্ঠুরতার। তীব্র দৈহিক সংরাগের পরিপ্রেক্ষিতে কুণাল কর্তৃক

প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে এরকম অমানবিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। 'এই চরিত্র-রচনায় ঔপন্যাসিকের সাফল্য স্বীকার করতে হয়, যদিও মনের গভীরে কোনো পিছুটান কিংবা প্রবৃত্তিতাড়িত কার্যাবলীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া না থাকায় তা উচ্চাঙ্গের শিল্প হয়ে উঠতে পারেনি' (ক্ষেত্র গুপ্ত ১৯৯৪ : ১৫০)।

কুঞ্জরকর্ণ চরিত্রটিও অপেক্ষাকৃত সফল। সে খল ও চক্রান্তকারী, কিন্তু স্বীয় ধর্মবিশ্বাসে অটল ও অবিচল। তার চরিত্রে ভালো ও মন্দগুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন লেখক। সে হয়তো পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না, কিন্তু শিল্পের মর্যাদা পেয়ে যায়। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র, যেমন রাধগুপ্ত, পরিষ্যরক্ষিতা, বুদ্ধশিষ্য উপগুপ্ত, বৌদ্ধ চণ্ডাল প্রভৃতি চরিত্র পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে একান্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব চরিত্র চিত্রণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঔচিত্যবোধের অনুবর্তী।

ভারতবিদ্যাবিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *কাঞ্চনমালা* রচনা করেছেন তাঁর সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে। গবেষণালব্ধ বিপুল অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে রচিত এ-উপন্যাসের পট-পরিবেশের বর্ণনা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন তিনি, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাঁর বর্ণনার গুণে প্রায় দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বের এক আলো-অন্ধকারময় জগৎ আমাদের অনুভবলোকে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে এবং অর্জন করে বাস্তব সত্যের মর্যাদা। উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরা ফিরে যাই দূর-অতীতের গহনলোকে। শিল্পের সত্য উন্নীত হয় শাশ্বত সত্যে। এক্ষেত্রে শাস্ত্রীর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের একটি বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি? হৃদয়ে হৃদয় প্রেমডোরে বাঁধা দেখিয়াছ কি ? নয়নের আড় হইলে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায় দেখিয়াছ কি ? ...
> দেখিবে কোথা হইতে? অবোধ মানুষ আহারের জ্বালায় ব্যস্ত, এরূপ দুর্লভ প্রেমরাশি কোথা হইতে দেখিবে? পৃথিবীতে এরূপ অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশি কদাচ কখনো মিলে বলিয়া কবিরা লেখেন বটে, কিন্তু কাজে মিলে না।
> একবার মিলিয়াছিল। দুই হাজার বৎসর আগে পাটলিপুত্র নগরে একবার মিলিয়াছিল, সেইখানে একবার দেখিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময়, গঙ্গার তীরে অশোক রাজার প্রমোদকাননে, এইরূপ দুইটি হৃদয় মিলিতে দেখিয়াছিলাম। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ৮২)

এরকম নাটকীয়তামণ্ডিত ভাষাকৌশল প্রয়োগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাঠককে নিয়ে যান বহুদূর অতীতের এক অনুভবগম্য স্বপ্নলোকে। কুহেলিঘেরা এক জগৎ অতিদ্রুত উন্মোচিত হয়ে যায় পাঠকের অভিজ্ঞতালোকে। বাস্তবতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় কল্পকথা আর রোমান্সের রহস্য। যার পরিপ্রেক্ষিতে কুণাল আর বৌদ্ধ চণ্ডালের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার সেই অতিলৌকিক ভাষ্যটিও মুহূর্তের মধ্যে অর্জন করে তুমুল বিশ্বাসযোগ্যতা।

কাঞ্চনমালা উপন্যাসের ভাষা বঙ্কিম-অনুসারী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভাষা কতবেশি রপ্ত করেছেন তা এ-উপন্যাসপাঠে অনুধাবন করা যায়। 'বঙ্গদর্শনে' যখন এটি প্রকাশিত হয় তখন অনেকেই মনে করেছিলেন এটি বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা। লেখকের নাম মুদ্রিত না হওয়াই এ-বিভ্রান্তির কারণ। সুকুমার সেনের মতে, হরপ্রসাদ

শাস্ত্রীর গদ্যভাষায় একই সঙ্গে প্রভাব পড়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের। তবে এই পর্যায়ের রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট।[৯] বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫) এবং *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮)-এর রচনারীতির প্রভাব এ-উপন্যাসে একেবারে দুর্লক্ষ নয়। দুটি উদ্ধৃতি লক্ষণীয়, প্রথমটি বঙ্কিমচন্দ্রের, দ্বিতীয়টি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর :

> ১. কি যেন হারাইয়াছি — যেন তাই হারাইবাতে জীবনসর্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে — যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি — কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল — সুখের মাত্রা যেন পুরিল না — যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।
> (বঙ্কিম ১৩৯৫ : ৪৯৬)
>
> ২. যেন মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। কি যেন হারাইয়াছি, আশা যেন পুরিল না। যে সুখে এতক্ষণ নিমগ্ন ছিলাম, উহা যেন আর ইহজন্মে ফিরিয়া আসিবে না। যেন যে সকল আশা এতক্ষণ করিতেছিলাম, তাহা যেন স্বপ্ন, কখনো পুরিবে না। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ৯১)

উপরের ১ ও ২-সংখ্যক উদ্ধৃতি যথাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণকান্তের উইল* ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *কাঞ্চনমালা* থেকে গৃহীত। ভাষিক বয়নে দুটি উদ্ধৃতি যে কতবেশি কাছাকাছি তা যে-কোনো পাঠকের পক্ষেই অনুধাবন সহজ।

এ উপন্যাসে চকিতে কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়েছে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যস্টাইল। যেমন :

> কণ্ঠরত্ন! যাহাতে তোমার এত আমোদ তাহা শুনিতে কি আমার অনিচ্ছা হইতে পারে? (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ৮৮)

বিদ্যাসাগর তাঁর *শকুন্তলা* গ্রন্থে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাতের নাটকীয় মুহূর্ত যোজনায় এ-রীতির বাক্য প্রচুর ব্যবহার করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *কাঞ্চনমালায়* প্রধানত ব্যবহার করেছেন সংস্কৃতবহুল গদ্যভাষা। এ-ভাষা ঋজু, সমাসবহুল এবং প্রায়শই নাটকীয়। যেমন :

> এইরূপ প্রণয়পূর্ণ হৃদয়োন্মাদক বাক্যলহরী সৃজন করিয়া উভয়ে উভয়কে মোহিত করিতেছেন। উচ্চপর্বতোপরি শান্ত সমীরণ বহিতেছে, নির্মল আকাশে উজ্জ্বল তারা জ্বলিতেছে, জগৎ যেন তাঁহাদের অগাধ অপার অনন্ত প্রশান্ত প্রণয়ের প্রতিকৃতি। ঝিল্লিরব যেন তাঁহাদের প্রণয়পূর্ণ হাস্যলহরীর প্রতিধ্বনি। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ৯১)

শাস্ত্রীর গদ্য যে পট-পরিবেশের বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনায় অনবদ্য ও অব্যর্থ তা উপর্যুক্ত বর্ণনাংশে সুপ্রত্যক্ষ। এ-গদ্য একই সঙ্গে অনুভূতিগীতল এবং আবেগময়তায় সমৃদ্ধ।

একথা ঠিক যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম শ্রেণির ঔপন্যাসিক নন। ভারততত্ত্ববেত্তা হিসেবেই তাঁর পরিচিতি সর্বপ্রসারী। প্রাচীন ভারতবর্ষের যাপিত জীবন ও আচরিত ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্ম ও জীবনবিষয়ক যে আগ্রহ তাঁর অন্তর্লোকে সঞ্চারিত তারই শিল্পিত স্বাক্ষর *কাঞ্চনমালা*। ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনা-কিংবদন্তির যোগে এ-উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অনবদ্য। শিল্পের আনন্দ আর

ইতিহাসের সত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এ-উপন্যাসে। বৌদ্ধধর্মের বিস্তারপর্বের আখ্যান হিসেবে *কাঞ্চনমালা* বাংলা উপন্যাসের ধারায় যোগ করেছে অসামান্য ব্যঞ্জনা।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রকৃত নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য। একবার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শিব বা হরের প্রসাদে সেরে ওঠায় তাঁর নতুন নামকরণ হয় হরপ্রসাদ।

২. *কাঞ্চনমালা* প্রথম প্রকাশিত হয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৯-৯০ সালে। কিন্তু এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। এই বিলম্বের কারণ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন : '"কাঞ্চনমালা" প্রকাশের জন্য যত্ন করি নাই। কেন, কি বৃত্তান্ত — সে অনেক কথা — বলিয়া কাজ নাই।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহে'র (প্রথম খণ্ড) "প্রাসঙ্গিক তথ্য" অংশে এতৎপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে — ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৪ আষাঢ় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হরপ্রসাদ বলেছেন — 'আমার সহিত তাঁহার দুই-তিনবার ঘোরতর মতভেদ হইয়াছিল, এমন কি, তাহার জন্য আমাকে কিছুদিন বাংলা লেখা ছাড়িতে হইয়াছিল।" গোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য ও গণপতি সরকার *কাঞ্চনমালা* প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাবের কথা জানিয়েছেন। 'রচনা-সংগ্রহে'র "প্রারম্ভ-বচন"-এ সুকুমার সেন বলেছেন : 'শোনা যায়, কেন জানি না কাঞ্চনমালা বঙ্গদর্শনে ছাপা হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রীত হননি। ... প্রীত না হবার কারণ কী তা বলা দুষ্কর। মনে হয়, তিনি হয়তো আশঙ্কা করেছিলেন যে গল্প লিখে হরপ্রসাদ নিজের পথ — ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ আলোচনা — থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়বেন।' (দ্রষ্টব্য : শাস্ত্রী ১৯৯১ : [২০], ১৮৯)

৩. সম্রাট অশোক ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের(খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৪-১৮৫) তৃতীয় রাজপ্রতিনিধি। তাঁর পূর্ণ নাম অশোক মৌর্য। তিনি জন্মগ্রহণ করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৩০৪ অব্দে। অশোকের পিতা বিন্দুসার এবং মাতা রানী ধর্মা। রানী ধর্মা ছিলেন বিন্দুসারের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন রানী। সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য অশোক এক পর্যায়ে মৌর্য সেনাবাহিনীর উচ্চপদে আসীন হন। এর ফলে তাঁর ভাইদের ঈর্ষা বেড়ে যায়। বিশেষত জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুষীম তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে সুষীমের অযোগ্যতার কারণে তক্ষশীলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমনের জন্য বিন্দুসার সেখানে অশোককে প্রেরণ করেন। অশোককে পেয়ে সেনাবাহিনী উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। প্রায় বিনা যুদ্ধে অশোক বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন। বিন্দুসারের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে যখন তাঁর পুত্রদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী বিবাদ শুরু হয় তখন অশোক তাঁর ভাইদের নির্মমভাবে হত্যা করে খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে রাজসিংহাসনে আসীন হন। অতঃপর তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন; এবং পূর্বে বাংলাদেশ ও আসাম, পশ্চিমে ইরান ও আফগানিস্তান, উত্তরে পামির গ্রন্থি থেকে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। অশোকের এক ভাই কলিঙ্গ রাজ্যে আশ্রয় নিলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ২৬৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে (মতান্তরে ২৬১ খ্রিপূ) কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। এই রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ্যের প্রায় একলক্ষ এবং অশোকের দশ হাজার সৈন্য প্রাণ হারান। যুদ্ধের এই রক্তক্ষয়ী বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করে তিনি তীব্র বেদনাভারে সমর্পিত হন এবং এই বিনাশী পথ পরিহার করে অহিংসার পথে সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারকদের প্রেরণ করেন। (এই বিষয়ে অধিক জানার জন্য দেখুন Ven. S. Dhammika, The Edicts of King Ashoka, Buddhist Publication Society, Kandy, Srilanka, 1993)

৪. মৌর্য রাজবংশের সূচনা হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে (মতান্তরে)। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মগধের নন্দবংশীয় রাজবংশকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ-কাজে তাঁকে সহযোগিতা প্রদান করেন ইতিহাসখ্যাত কৌটিল্য বা চাণক্য। কথিত আছে যে

নন্দবংশীয় রাজার কাছে অপমানিত হয়ে চাণক্য অবস্থান নেন ভিন্দিয়া অরণ্যে। সেখানেই তার সাক্ষাৎ ঘটে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর ভারতীয়দের মধ্যে এককেন্দ্রিক সাম্রাজ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় তা চন্দ্রগুপ্ত অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। সেই চিন্তাধারার অনুসারী চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্ডারের উত্তরসূরি ম্যাসিডোনিয়ান সেনাপতি সেলুকাস নিকেটরকে পরাজিত করেন। এভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের অবস্থান দৃঢ় ও সংহত হয়। এই সাম্রাজ্যের প্রথম শাসক চন্দ্রগুপ্ত (রাজত্বকাল ৩২৪-৩০০ খ্রি.পূ.), দ্বিতীয় শাসক বিন্দুসার (রাজত্বকাল ৩০০-২৭২ খ্রি.পূ.), তৃতীয় শাসক অশোক।

৫. Kunal...was the son of Emperor Ashoka and Queen Padmavati, and presumptive heir to the Mauryan Empire which once ruled almost all of the Indian subcontinent. While he was supposed to be the future heir to the empire, he was blinded by another of Ashoka's wives, Tishyaraksha, at a young age in jealousy. While he was not able to take the throne, his son Samprati, became his heir. (দ্রষ্টব্য : Kunala, Wikipedia, The free Encyclopedia)

৬. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর প্রবন্ধে 'শূদ্র রাজা' অশোকের আদেশে ব্রাহ্মণদের অধিকার ও মর্যাদাচ্যুতি এবং এর ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অসন্তোষ ও বৌদ্ধবিরোধী মনোভাবকেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ বলেছেন। পশুবলি নিষেধ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা নীতি প্রয়োগ এবং ধর্মমহামাত্র নিয়োগের ফলে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বলোপ প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণেরা অশোকের বিরুদ্ধে যান। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : ১৯০)

৭. When the prince was eight years old, the king wrote (in Prakrit) to the tutors that Kunala should begin his studies. One of Ashoka's wives who wanted to secure the succession to her own son, being then present took up the letter to read it. She secretly put a dot over the letter `a' change Adheeyu into Andheeyu--another word, meaning he must be blinded. Without rereading the letter, the king sealed and dispatched it. The clark in Ujjayini was so shocked by the contents of this letter that he was unable to read it aloud to the prince. Kunala, therefore, seized the letter and read the cruel sentence of his father. Considering that as yet no Maurya prince had disobeyed the chief of the house, and unwilling to set a bad example, he stoutly put out his eyesight with a hot iron. (দ্রষ্টব্য : Kunala, Wikipedia, The free Encyclopedia)

৮. ব্রিটিশ ইতিহাসবেত্তা H. G. Wells বলেন, 'Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their majesties and graciousnesses serenities and royal highnesses and the like, the name of Asoka shines, and shines, almost alone, a star. (দ্রষ্টব্য : Ashoka, Wikipedia, The free Encyclopedia)

৯. বাংলা লেখায় তাঁর গুরু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ...বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা তাঁর এতটাই আয়ত্ত হয়েছিল যে তাঁর 'কাঞ্চনমালা' নামে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাটি অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বলে ভুল করেছিল। (গল্পটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন বঙ্গদর্শনে প্রায় লেখকের নাম উল্লিখিত হত না। এর কারণ ঠিক জানা যায় না। অনুমান হয়, লেখকের নাম অপরিচিত হলে পাঠকেরা তা উপেক্ষা করতে পারেন এই আশঙ্কা।)...(তখন সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মেজোদাদা সঞ্জীবচন্দ্র। ...আমার বিশ্বাস হরপ্রসাদ সঞ্জীবচন্দ্রেরও স্নেহ ও সাহচর্য লাভ করেছিলেন, এবং এই স্নেহ ও সাহচর্য তাঁর বাংলা লেখার রীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। হরপ্রসাদের স্টাইল যে সঞ্জীবচন্দ্রের রীতির বেশ কাছাকাছি তা তার মধ্য ও শেষ জীবনের লেখা থেকে বোঝা যায়। (শাস্ত্রী ১৯৯১ : [১৭-১৮])

গ্রন্থপঞ্জি

ক্ষেত্র গুপ্ত, ১৯৯৪, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, কলিকাতা।
নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, ২০০৬, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাসচিন্তা*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।
বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), দ্বাদশ প্রকাশ ১৩৯৫, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।
শিপ্রা রক্ষিতদস্তিদার, ২০০৯, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), ১৯৯১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।
Ven. S. Dhammika, 1993, *The Edicts of King Ashoka*, Buddhist Publication Society, Kandy, Srilanka.
Romila Thapar, 1963, *Asoka and the Decline of the Mauryas*, London.